OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 340 - 350
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সৃজনশীল লোকপুরাণের প্রয়োগ : প্রসঙ্গ সোহারাব হোসেনের ‘গাঙ বাঘিনি’ উপন্যাস

সৌরভ মজুমদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: souravmajum995@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Soharab Hossain, Novel, Gang Baghini, Sundarban, Creative Myth, Folktales, Taboo, Socio-Political Background, Refugee, International Border, Illegal Activities.

Abstract
People living in extreme geographical regions tends to be dependent on the geological and ecological forces of their native land for the very sake of maintaining their existence. Those uncontrollable forces become godlike entities, which the people fear. Gradually, they weave lore about the wraths and boons of those gods, exercise taboos and make sacrifices to keep those heavenly or hellish bodies content. This myths become an essential part of their lives and their sustenance—which, sort of, defines the people in their entirety. Sundarbans, the southern part of West Bengal and Bangladesh, is one of such extreme locations where maintaining life means continuous struggle with the unpredictable sea-weather, vicious wild-life and severe lack of enough food, drinking water and means of earning. Turbulent sea-waves or hurricanes destroy their homes, their family members get killed by ferocious tigers, crocodiles or snakes while collecting honey, wax or timber from the jungle. Thus, these entities become Gods in their fear-induced mythologies—for example, the tiger becomes ‘Dakshinray’, the emperor and sole owner of the honey and wax of ‘Bhati’ area. ‘Banabibi’ and ‘Shahjanguli’ are the godsend saviours of the oppressed. The myth-believers implement these larger-than-life figures as the symbol of eternal oppressors and recurrent saviours even in present time as well. Since the time of Independence, the socio-political-economic consequences of being an international coastal border area disturb the peacefulness and simplicity of the life of inhabitants. The poachers, weapon dealers, pirates, illegal immigrants along with the coastguards, foresters, politicians, military and the middlemen such as ‘aratdars’ or ‘khatidars’ leech on the lives of the helpless locals. These greedy, evil entities seen as incarnations of ‘Dakshinray’, while some wise or brave locals believed to be avatars of ‘Banabibi’ or ‘Kapil Muni’ create the base of ever-enriched seedbed of ‘Creative Myth’—which is newer and creative iterations of old mythical lore. Eminent Bengali novelist Soharab Hossain’s novel ‘Gang Baghini’ is

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

centred round the life and situation of Sundarbans. How the novelist implemented a newer version of the local myth, is the object of our discussion.

Discussion

একদিকে গভীর বাদা, জলজঙ্গল, বাঘ-সাপ-কুমির, অন্যদিকে স্মরণাতীত কাল থেকে প্রবাহিত লোকসংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস, লোকপুরাণের বিরামহীন কিন্তু সদা-পরিবর্তনশীল ধারাস্রোত— এই দুই দুনিয়ার মাঝে অবস্থানরত সুন্দরবনের মানুষ যেন এক অসীমান্তিক দয়াহীন বিরাটত্বের সামনে “পিঁপড়ে মাত্র, অন্য কিছু নয়”[১] — পিঁপড়ের মতই তারা তুচ্ছ, অসহায়ও। নশ্বর ও অবিনশ্বর এই দুই জগতের সঙ্গে মানুষের আশ্চর্য মিথস্ক্রিয়ার নির্মাণ ‘সুন্দরবন’ ভৌগোলিকভাবে দ্বৈত অস্তিত্বে উদ্ভাসিত— একদিকে ‘লাট’ অঞ্চলের ১০৯০টি গ্রামের অজস্র মানুষ ও সংশ্লিষ্ট বনভূমি নিয়ে গড়ে ওঠা ‘মানুষবন’ অংশ, যা ‘মানষেলা’ নামেও পরিচিত; আর অন্যদিকে আছে যথার্থ সুন্দরবন, যেখানে সুদরী, গরান, হেঁতাল, পাশুর, ধুন্দুল গাছের শামিয়ানার নীচে আঁধার বনের আলোছায়ায় গা মিশিয়ে ঘুরে বেড়ায় ডোরাকাটা ‘বনের বাবু’ কেঁদোবাঘ বা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার— যেখানে মানুষের পা পড়ে ক্বচিৎ-কদাচিৎ— সভ্য জগতের সীমানার বাইরে আশ্চর্য গোপনতায় যা দীর্ঘকাল ধরে রক্ষা করে এসেছে ‘আঠারো ভাটির সম্পদ’-কে। কবির কল্পনায় মূর্ত হয়ে ওঠে এই সুন্দরবন— যেখানে জল-জমিন-আশমানে পরিব্যাপ্ত আদিম বন্য প্রকৃতির মাঝে কেবল নিজের বাপ-পিতেমোর থেকে পাওয়া লোকবিশ্বাস, মিথ, একরাশ ভয় আর একপেট খিদে নিয়ে হাজির হয় কিছু মানুষ— কাঠ কাটতে, মধু আনতে, মাছ কিংবা কাঁকড়া মারতে—

“এইভাবে পড়ে আছি
নদী-খাল-জঙ্গলের দেশে
আমি তো লাটের ছেলে
নোনামাটি মানুষের কাছে
আমারো রয়েছে দায় জন্ম-সুবাদে
তাই আমি বিজিয়ারা-বনবিবি
আর সেই কলস জঙ্গলে
যেখানে পেটের দায়ে
মানুষেরা চলে আসে কাঠের সন্ধানে
কিংবা সেই জম্বুর চড়ায়
দল বেঁধে সাবাড়ের কাজে
শীতের সমুদ্র থেকে
ধরে আনে রকমারি মাছ
আমিও তাদের সঙ্গে
মিলে মিশে এক হয়ে যাই...”[২]

“...সেই জীবনটা, বনচারী জীবনটা কেমন। তাঁদের আচরণ বিশ্বাস কেমন। তাঁরা ভিতরে ভিতরে কতখানি সৎ। তাঁরা ভিতরে ভিতরে কতখানি বড়। তারা এই গহন অরণ্য ও গহীন সমুদ্রের মধ্যে থেকেও বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে Interact করছে”[৩] কীভাবে— এ সমস্তই সোহারাব হোসেন (১৯৬৬-২০১৮) তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর নবম উপন্যাস ‘গাঙ বাঘিনি’ (২০১১)-তে। প্রকৃতি-মানুষ-মিথ— এই তিনভুবনের পারস্পরিক বিক্রিয়ার ফসল এ উপন্যাস। সমসময়ের জটিল, জটিলতর সমস্যাগুলিকে কীভাবে চিরকালীন প্রকৃতি ও লোকবিশ্বাসের সঙ্গে অন্বিত করেন এই মানুষগুলি, কীভাবে স্থির করেন নিজেদের অভিমুখ— বেঁচে থাকার, আত্মজনদের বাঁচিয়ে রাখার অভিমুখ— সেই অন্বেষণই বোধহয় ‘গাঙ বাঘিনি’-এর গোড়ার কথা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রথম উপন্যাস থেকেই ভীষণভাবে 'আঞ্চলিক' সোহারাব হোসেন। বসিরহাটের ভূমিপুত্র, আদ্যন্ত কৃষক পরিবারের সন্তান সোহারাব খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাঁর অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় মানুষগুলিকে, জেনেছেন তাঁদের ভাষা, কৃষ্টি, লোকবিশ্বাসকে— কোনও বিত্তগত বা চিত্তগত দূরত্ব তাঁর দৃষ্টিকে আবিল করেনি। কথাকার বাস্তবের অন্তর্বর্তী মায়া পরিসর খনন করতে করতে বাড়ির পাশে আরশি নগর এবং সেই নগরে বসত করা পড়শির সাথে পরিচিত হয়েছেন। খুঁজে পেয়েছেন চেনা মানুষের অচেনা আদল। সোহারাবের উপলব্ধি এরকম -

> "পরিচিত হয়ে বুঝি তারা সব অচিন মানুষ। কতদিন ধরে, বছর বছর ধরে, দেখছি অথচ তারা কত অচেনা। খাঁচার ভিতর লুকিয়ে থাকা সেই যে অচিন সত্তার সঙ্গে আমার মোকাবিলাটি কখন যেন গল্প হয়ে যায় উপন্যাস হয়ে যায়।"[৪]

একইসঙ্গে সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। আর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক সচেতনতার কারণেই হয়তো নাগরিক ব্যক্তি-মানুষের বৃদ্ধ মননগত বা যাপনশৈলীগত দ্বন্দ্ব বা নরনারী সম্পর্কের টানাপোড়েন-এর পরিবর্তে গ্রাম্যজীবনের বৃহত্তর কিন্তু মরণবাচনের প্রশ্ন তুলে দেওয়া সমস্যাগুলিই ব্যক্ত নয় কেবল, সামগ্রিকভাবে যা সমষ্টিকে প্রভাবিত করে, বিপন্ন করে— সেগুলিকেই বিষয় করে তোলেন তিনি তাঁর উপন্যাসের। আঞ্চলিকতা বা সমসাময়িকতাতেই আবদ্ধ নন তিনি, সীমার মাঝেই অসীমকে ধরার চেষ্টা অব্যাহত তাঁর গল্প-উপন্যাসে— বরাবরই। ইতিহাস, গূহ্য-ধর্মীয়তত্ত্ব, জাদুবাস্তবতা, লোকবিশ্বাস, মহাকাব্য —এ সমস্তই তাঁর উপন্যাসগুলির মূল কাহিনিসূত্রের সঙ্গে খাপে খাপে এঁটে থাকে, জড়িয়ে থাকে ওতপ্রোতভাবে। কিন্তু সে সংযোজন নির্ভার, কাহিনিকে হোঁচট খেতে হয় না সেজন্য। 'মহারণ', 'মাঠ জাদু জানে', 'সরম আলির ভুবন', 'দ্বিতীয় দ্রৌপদী' ইত্যাদি উপন্যাসে এভাবেই মিলে মিশে গেছে আঞ্চলিক পরিবেশ, সমসাময়িক পরিস্থিতি এবং সেই সঙ্গে কখনও ইতিহাস, কখনও ধর্মতত্ত্ব, কখনও লোকসংস্কৃতি, কখনও আবার জাদুবাস্তবতা। কিন্তু এ সমস্ত কিছুকে স্থান দেওয়ার জন্য থান ইটের আকারে মহা উপন্যাসের অবতারণা করেন না লেখক। বস্তুত, "তাঁর অন্বিষ্ট বিকল্প জীবনবোধের প্রস্তাবনা এবং ওই সূত্রে বিকল্প আখ্যান প্রকল্প ও প্রকাশ পদ্ধতি।"[৫] মাত্র ১৬৬ পৃষ্ঠার উপন্যাস 'গাঙ বাঘিনি'-র ভূমিকা 'বলার কথা'-য় তাঁর সপ্রতিভ উচ্চারণ—

> "উপন্যাসের বিষয় উপস্থাপনের নানা রীতি (।) কোনও ভূখণ্ডে (র) আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় জীবনে (র) সুবিস্তৃত কাহিনি রচনাই উপন্যাসের একমাত্র শিল্পপথ নয়। এ-কালের পদ্ধতি, সম্ভবত, রূপক-প্রতীক ও সাংকেতিকতার মাধ্যমে তুলনায় স্বল্প আয়তন বিশিষ্ট কাহিনিতে কালের মহাইঙ্গিতটিকে মূর্ত করা। ব্যাপারটা অনেকখানি অ্যাটমবোমের মতো। ছোট্ট অ্যাটমবোমা যেমন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি আজকের উপন্যাস সাংকেতিক ও ব্যঞ্জনাবদ্ধ ঘটনায়, চরিত্রের কথায় ও কর্মে, মিথে ও পরমাণু পরিমাণ মননের চিত্রণে নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের চালচিত্রকে প্রতিফলিত করে। ...সেই রীতি মেনে 'গাঙ বাঘিনি'র পরিকল্পনা ও রূপায়নের প্রয়াস করেছি।"[৬]

স্পষ্টতই, 'গাঙ বাঘিনি' সোহারাবের উপন্যাস রচনার মূলধারাটি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও প্রয়াস নয়।

'গাঙ বাঘিনি'-র মূল কাহিনিসূত্রটি গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের কাঠকাটানিয়া, বাউলে, সাবাড়ে প্রভৃতি বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ এবং কোস্টগার্ড তথা সামগ্রিকভাবে প্রশাসনের পারস্পরিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। কাহিনির সূত্রপাত মাছমারা ট্রলারে জলদস্যুদের আকস্মিক আক্রমণ ও লুণ্ঠনের সংবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে। এই আক্রমণের কারণে হলধরদের কাঠকাটানিয়া দলটি কাঠ কাটতে যাওয়ার অনুমতি পায় না। কোস্টগার্ড অধর ও বঙ্কিমকে সীমান্ত পাহারার জন্যে যেতে হয় বাংলাদেশ-সীমান্তের মনুষ্যবর্জিত 'ছোটো চামটে' দ্বীপে। বাদার 'জ্যান্ত বনবিবি' সাবাড়ে রমণী কাজলার প্রতি অধরের আকর্ষণকে ব্যবহার করে হলধর ও হানিফ সাঁইদার বেআইনিভাবে ছোটো চামটেতে কাঠ কাটার অনুমতি আদায় করে অধরের কাছ থেকে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় খানসেনাদের অত্যাচারে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে চলে আসা অধর, সীমান্তে উপস্থিত হওয়ার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় রোমন্থন করে চলে সেই অন্ধকারময় উচ্ছিন্ন দিনগুলির স্মৃতি। কোনও এক বাঘিনির যুবতী-গন্ধে আকুল পুরুষ-বাঘের সীমান্তের কাঁটাবেড়া পেরিয়ে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় আসার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা অধরের রক্তক্ষয়ী স্মৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে থাকে কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। বাঘের

পেটে স্বামী হারানো, সাতজেলের বিধবা পাড়ার বাসিন্দা কাজলার ঘর-ভাঙার বেদনাময় স্মৃতিও মাঝে মাঝেই কান্নার সুরে ভরিয়ে তোলে ছোটো চামটের আকাশ-বাতাস-নদী-সমুদ্র। ছিন্নমূল অধর শিকড় চারিয়ে এক নতুন দ্বীপ সৃজন করতে চায় কাজলার শরীরে —কিন্তু লৌকিক বিধিনিষেধের বেড়া ভেঙে এগোতে পারে না কিছুতেই। ধীরে ধীরে মানসিক ভারসাম্যহীনতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে অধর। হলধর-হানিফরা চায় কাজলাকে ব্যবহার করে নিজেদের কার্যসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত অধরকে ভুলিয়ে রাখতে। কিন্তু ঘটনাক্রম তাদের আশা পূর্ণ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। আড়তদারে আড়তদারে রেষারেষির ফলে তাদের কাঠবোঝাই নৌকা আটক হয়। বনভূমির গভীরে মাওবাদীদের উপস্থিতির চিহ্ন আবিষ্কার করে হানিফ। অন্যদিকে জম্বুদ্বীপে বসতি উচ্ছেদের খবর, বাদার মাওবাদী-জলদস্যু-খটিদারে যোগসাজশ, সমুদ্রপথে অস্ত্র-পাচার, কোস্টগার্ডদের বিরুদ্ধে বেআইনি কাঠপাচারে সহায়তার অভিযোগ ক্রমেই বিপন্ন করে তোলে অধরকে, পায়ের তলা থেকে মাটি হারিয়ে যেতে থাকে তার, আবার। সীমান্ত পেরোতে চাওয়া বাঘটির মৃত্যু সংবাদ তাই যেন নিজেরই পরাজয়ের বার্তা হয়ে পৌঁছয় তার কাছে। কাজলাকে সে গুলি করে পায়ে। নিজেদের পিঠ বাঁচাতে কাঠকাটানিয়া দলটিকে মাওবাদী বলে চিহ্নিত করে ফোর্স চেয়ে পাঠায় বঙ্কিম। মৃতপ্রায় কাজলাকে নিয়ে ছোটো চামটের মৃত্যু উপত্যকায় বনবাসে রয়ে যায় হলধর-নিতাই-মন্টারা।

বাঘ-কুমির-সাপের সঙ্গে নিত্য লড়াই সুন্দরবনের জল-জঙ্গলের অধিবাসীদের—বিশেষত বাউলে-মউলে-মাছমারা-কাঠকাটানিয়াদের। এই সমস্ত পশুর 'মান্যা'-ই টোটেম, অর্ধপশু-অর্ধমানবরূপী-দেবতার স্তর অতিক্রম করে পরিণত হয়েছে ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণরায় বা বনবিবি, কুমিরবাহন কালু রায়, বড়খাঁ গাজি প্রভৃতি লোকদেবতায়। এই সমস্ত দেবতাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, মানুষের কল্পনায় এদের উপকারী ও ক্ষতিকর রূপ— এ সমস্ত নিয়েই গড়ে উঠেছে সুন্দরবন অঞ্চলের নিজস্ব মিথজগৎ — যা মানুষের জীবনযাপনের প্রায় প্রতিটি স্তরকেই নিয়ন্ত্রণ করে। জল-জঙ্গল-আকাশের মাঝে মানুষের অসহায় অনিশ্চিত অস্তিত্ব একুশ শতকেও তাকে বাধ্য করে বাদায় নেমে বনবিবি-দক্ষিণরায়ের নামে জয়জয়কার দিতে, গড়বন্দি-বনবন্দি-দেহবন্দি করতে, চালানমন্ত্র পড়তে। আজও বাদায় নামলে মউলে বা কাঠকাটানিয়ার জীবনমরণ জমা থাকে বাউলে বা সাইদারের হাতে। একমাত্র তার মন্ত্রেই তফাৎ হটে বাঘ-সাপ, দাঁতকপাটি লাগে হাঁ-মুখ বাঘের। বনের 'মান্যা'-দের সন্তুষ্ট করতে নানা 'ট্যাবু'-র প্রকোপ মাথা পেতে মেনে নেয় মানুষ— কী বাদায়, কী বসতিতে। সুন্দরবনের মানুষের জীবনচর্যার অবিচ্ছেদ্য শুধু নয়, অতিপ্রয়োজনীয় অংশ এই 'মিথোম্যানিয়া', মন্ত্র-তন্ত্র, আচার-বিশ্বাস, ট্যাবু— এসমস্ত কিছুকে সোহারাব হোসেন তাঁর উপন্যাসের অলংকার রূপে কেবল ব্যবহার করেননি, কাহিনি ও প্লটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়ে নিয়েছেন। বস্তুত বলা যায়, তাঁর গোটা উপন্যাসটির প্লটের আধার হিসেবেই তিনি ব্যবহার করেছেন বনবিবি-দক্ষিণরায় সংক্রান্ত মিথটিকে। কিন্তু এই প্রচলিত মিথটিকে তিনি যথাপ্রাপ্তরূপে গ্রহণ করেননি তাঁর উপন্যাসে। কাহিনির প্রয়োজনে তাকে ভেঙে-চুরে নিয়েছেন, নানা সংযোজনক বিয়োজন ঘটিয়ে সৃষ্টি করেছেন মিথের এক নবরূপ। আর—

> "নতুন করে এই মিথরচনার ফলে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, সমাজবিজ্ঞানীর চোখে তাই হল Creative Myth বা সৃজনশীল লোকপুরাণ। এই সৃজনশীলতার মধ্যে একটি নিজস্বতা থাকে যা একই বিষয় সম্পর্কে অন্যের দেওয়া বর্ণনার তুলনায় সেই সৃষ্টিশীল বর্ণনাকারীর প্রদত্ত বিবরণটিকে স্বকীয় করে তোলে। অর্থাৎ মিথ শুধু বর্ণনাই নয়, নবরূপ দেওয়ার জন্য সৃষ্টিশীল বর্ণনা।"[৭]

এক্ষেত্রে সহজেই প্রতিতুলনায় এসে যায় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' বা 'নাগিনীকন্যার কাহিনি'-র মত উপন্যাস, যেখানে প্রচলিত মিথের সঙ্গে কল্পনার মিশেল ঘটিয়ে নিচুজাতের কাহারদের চড়কের পাটায় চড়ার অনুষঙ্গে লেখক সৃষ্টি করেন বাণগোঁসাই-শ্রীহরির যুদ্ধ কাহিনি, কিংবা মনসামঙ্গলের মিথের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়ে দেন বিষবেদে সমাজের নাগিনীকন্যার কাল্পনিক কাহিনির।

সুন্দরবনের ক্রমউন্মোচনশীল অতীত গরিমার ইতিহাস নয়, লাট অঞ্চলের মানুষের জীবনের হাসি-কান্নার রোজনামচা নয়— 'গাঙ বাঘিনি'-তে সোহারাব হোসেন তুলে ধরতে চেয়েছেন সমসাময়িক নানা সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যাগুলি কীভাবে এখানকার মানুষগুলির জীবনের সহজ ছন্দকে বেসামাল করে দিচ্ছে, তার বিবরণ। বাঘের সঙ্গে নয়, সাপ কিংবা কুমিরের সঙ্গেও নয়, আজ সুন্দরবনের মানুষের প্রকৃত লড়াই যে মানুষেরই সঙ্গে— এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উঠেছে উপন্যাসটির কাহিনিবৃত্তে। মানুষে মানুষে এই শত্রুতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতকে স্পষ্ট করতে লেখক শুনিয়ে যান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সজীব কিন্তু মৃত্যুগন্ধী বর্ণনা— যার সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে উদ্বাস্তু মানুষের, পলায়মান মানুষের ছিন্নমূলত্বের বেদনা। এই বেদনাকেই লেখক বিশেষ থেকে নির্বিশেষের পর্যায়ে উন্নীত করে দেন। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিটি মানুষই যে কোনও-না-কোনওভাবে অন্য কোনও মানুষের কারণে ছিন্নমূল হয়ে পড়ছে, জীবনের মূলস্রোত থেকে শিকড়বিচ্ছিন্ন হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে, অন্য কোনও জীবনক্ষেত্রে শিকড় গাড়তে চাইছে কিন্তু বারবার ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে নানা বাধাবিপত্তি বা দুর্বিপাকের কাঁটাতারে— জীবনের এই সাধারণ সত্যটিকেই সোহারাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন এই উপন্যাসে। আর যে বিষয়কে আশ্রয় করে তিনি এই জীবনবীক্ষাকে রূপদান করেছেন, সেই বিষয়কে ধারণ করেছে সুন্দরবনের মানুষের আবহমানকালের জীবনাভিজ্ঞতাজাত মিথ— যাকে নবরূপ দিয়েছেন লেখক, সেই সঙ্গে তাকে দিয়েছেন এক অসামান্য প্রতীকী তাৎপর্য। যদিও ড. দেবব্রত নস্কর বলেন, -

> "বনবিবির পালাগানে বনবিবি, নারায়ণী, দক্ষিণরায় প্রমুখ চরিত্র প্রতীকী বা 'সিম্বলিক' বলেই মনে হয়"[৮]

— তবু তার প্রতীকী রূপটি যে অনেকটাই আচ্ছন্ন ছিল মূল মিথটিতে, তা বোধহয় অস্বীকার করা যায় না। সোহারাব হোসেনের 'গাঙ বাঘিনি'-তে বিনির্মিত মিথটির প্রয়োগে তার প্রতীকীধর্মিতা ও প্রাসঙ্গিকতা পাঠকের বোধের কাছে স্পষ্টতর হয়ে ধরা দেয়।

মাছমারা, কাঠকাটানিয়া, বাউলে, মউলেদের অনিশ্চিত জীবনযাপনে আশ্রয়ের খুঁটি বনবিবি, শাহজঙ্গুলি, বড়খাঁ গাজি বা কালুরায়ের উপর বিশ্বাস, যে এঁরা তাদের বাঘ-কুমির-সাপ বা অন্যান্য আরণ্যক অথবা সামুদ্রিক বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। যেমন ধোনা-দুখের পালায় মা বনবিবি রক্ষা করেছিলেন অসহায় দুখেকে, বাঁচিয়েছিলেন বাঘরূপী দক্ষিণরায়ের করালগ্রাস থেকে, তেমনভাবেই। কিন্তু আজ আর বাঘ-কুমির-সাপ হয়ে বিপদ আসে না, আসে মানুষের রূপ ধরেই। আসে জলদস্যুর রূপ ধরে, মাওবাদীদের রূপ ধরে, আড়তদার-খটিদারের রূপ ধরে— আসে কোস্টগার্ড বা ফরেস্টারের রূপ ধরেও। আজ সুন্দরবনের মানুষ বাঘ-কুমিরের চেয়েও বেশি ভয় পায় এইসব মানুষগুলোকে, কারণ—

> "বাঘ-কুমিরে আমাদের প্রাণ কেড়ে নেয় যখন-তখন, এটা কষ্টের। কিন্তু কোস্টগার্ডে-নেভিবাবুতে-ফরেস্টারে আমাদের ইজ্জত নেয়। এটা দুঃখের বাবু, বড় দুঃখের।"[৯]

বাঘ তথা দক্ষিণরায়ের মতই আচমকা হানায় জলদস্যুরা লুঠ করে নিয়ে যায় ইলিশভরতি ট্রলার।

> "গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া সুন্দরবনের রায়দীঘি, কুলতলি, কাকদ্বীপ, সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, ক্যানিং-এর মৎসজীবীদের প্রধান আতঙ্ক জলদস্যু।"[১০]

অত্যাচারী শাসকের মতই বাদার যুবতী নারীর ইজ্জত লুটে নিতে চায় সর্বশক্তিশালী ফরেস্টার-কোস্টগার্ড-নেভিবাবুরা। 'হাংরি টাইড'-খ্যাত অমিতাভ ঘোষ স্পষ্টই জানান, -

> "...বন-বিভাগের কর্তাদের হাতে এখন এত ক্ষমতা যে তাদের মর্জির উপর সুন্দরবনবাসীদের বাঁচা-মরাটা নির্ভর করছে।"[১১]

সাধারণ মানুষের টিকি বাঁধা যাদের কাছে, সেই সাবাড়ে ম্যানেজার, খটিদার, আড়তদাররা চূড়ান্ত শোষণ চালায় এদের অধীনে থাকা সাবাড়ে, মউলে, কাঠকাটানিয়া, মাছমারাদের উপর। আবার, নিজেদের পারস্পরিক রেষারেষির কারণে কখনও জলদস্যু, কখনও মাওবাদীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অন্য খটিদার বা আড়তদারের ইলিশবোঝাই নৌকো বা কাঠবোঝাই ট্রলার লুঠ করায়, কখনও ধরিয়ে দেয় পুলিশের হাতে। গরিবের বন্ধুর ভেক ধরে হাজির হয় মাওবাদীরা, কিন্তু ক্রমশ দেখা যায়, -

> "গরিবই ওমানকের মদতে গরিবরে মেরে ফেলতেছে।"[১২]

আর তাই ক্রমশ সুন্দরবনের মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে—

> "মানুষিই তো আসল বিপদ! বনের পশু পোষ মানে, মন্ত্রে বশ হয়। কিন্তু মানুষ হয় না। ওরাই বাদার আসল শত্তুর!"[১৩]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাই একালের সাইদার সাধনা করে মানুষ-বন্দির মন্তরের। মানুষই হয়ে ওঠে বাঘ-কুমির, মানুষই হয়ে ওঠে "... দক্ষিণরায়-বড়খাঁ গাজি খাঁর কালুয়ারা! ...ওরা মা বনবিবির ভাই শাহজঙ্গুলি আর বাবা কপিলমুনির শত্তুর!"[১৪] ইলিশবোঝাই ট্রলারে জলদস্যুর হানা তাই বাদাবনের মানুষের মিথোম্যানিয়ায় পরিণত হয় দক্ষিণরায়ের হানায়। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের অভিনয়ে 'ধোনা-দুখের পালা'-য় সংযুক্ত হয় নতুন আখ্যান— যেখানে দক্ষিণরায় তার সহচর বড়খাঁ গাজিকে হালুম-হুলুম কামনায় বলতে থাকে—

"শুনছি রোজরোজ কালা জঙ্গলে ইলিশ উঠতেছে ভালো
কোথা লুকাবি তারে রাক্ষস বাউলে আর যত আছে মালো
স্পিড বোডেতে গিয়ে ত্বরা ত্বরা আজ হানিব আক্রমণ
লুটিয়া ফিরিব উড়িয়ে নিশেন বাদার অজুত ধন।।"[১৫]

মাওবাদীরাও দক্ষিণরায় বলে চিহ্নিত হয়ে যায়, কারণ মিথের দক্ষিণরায়ও "যেরাম পেথমে বাদার বাইরির হানাদারের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা কোরেলো আর পরে হোয়েলো নরখাদক, ওনারাও তেমনি।"[১৬]

এই দক্ষিণরায়ের সঙ্গে মূল মিথের দক্ষিণরায়ের চরিত্রগত পার্থক্য বিস্তর। এই দক্ষিণরায়ে লেখকের কল্পনার প্রলেপ রয়েছে অনেকটাই। বস্তুত কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল', মরহুম মুনশী মহম্মদ খতের রচিত 'বোনবিবি জহুরানামা' ইত্যাদিতে দক্ষিণরায় বনবিবির যে মিথ পাওয়া যায়, তার থেকে লেখক সরে এসেছেন অনেকটাই। মিথের এই পরিবর্তন লোকমানসের স্বাভাবিক চরিত্রের কারণে ঘটতেও পারে কিন্তু 'গাঙ বাঘিনি'-তে মিথের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কাহিনিগত গুরুত্বই বেশি। এই নতুন মিথে মক্কানিবাসী বেরাহিম গাজি পরিণত হয় বসিরহাটের বেনিয়াতে, যে ময়ূরপঙ্খী নৌকো ভাসিয়ে এসে লুঠপাট করে নিয়ে যায় কেবল বাদার মোম-মধু-মাছ নয়, বাজার নারী গুলাল-বিবিকেও— যে গুলাল বিবিও মূল মিথে মক্কারই কন্যা। এই হানাদার বেরাহিম গাজির হাত থেকে বাদার মানুষের বেঁচে থাকার সম্বল মোম-মধু-মাছ-কাঠ রক্ষা করতে সুন্দরবনের দ্বীপ-দ্বীপান্তরের ভূমিপুত্র পুণ্ড্রক্ষত্রিয়রা— যাদের "নগুরে সভ্য মানুষরা... রাক্ষস বলে বিদ্রূপ করত"[১৭] তারা একত্রিত হল, এবং তাদের দলের নেতা নির্বাচিত হল দণ্ডাবক্ষ-নারায়নীর পুত্র দক্ষিণরায়। স্থানীয় মানুষদের নিয়ে তৈরি এই বাহিনির সাহায্যে বেরাহিমকে পরাস্ত করে দক্ষিণরায়। বেরাহিমের দলবল ডুবে মারা যায়, সে নিজে পালিয়ে যায় তার বড়ো স্ত্রী ফুলজানকে নিয়ে, পিছনে ফেলে যায় তার 'বাদার প্রেমিকা' গুলাল বিবিকে— যার সন্তান বনবিবি ও শাহজঙ্গুলি। বিজয়ী দক্ষিণরায় বাঘকে নিজের বাহনে পরিণত করে— যে বাঘকে লেখক বলেছেন "পুণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী দল,"[১৮] আর গুলাল বিবিকে পরিণত করে নিজের দাসীতে। বনবিবি-শাহজঙ্গুলি পালিয়ে গেলে তাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে সে। বীরত্বের কারণে দ্বীপে দ্বীপে মানুষ তার পুজো করতে শুরু করে। কিন্তু ক্রমশ "মানুষের ভক্তি পেয়ে, গরিবের বন্ধু আখ্যা পেয়ে"[১৯] যখন রাজা হয়ে, বিলাসবাসনে অভ্যস্ত, "কামে কামনায় মত্ত"[২০] হয়ে উঠল দক্ষিণরায়, সাধারণ মানুষের ধনসম্পদ লুটেপুটে 'ধনের পাহাড়' বানিয়ে তুলল, তখন সাধারণ মানুষ সাহায্য চাইল কপিলমুনির কাছে, যিনি ছিলেন "বিরাট মাপের প্রতিবাদী মানুষ"[২১]। বিপদ বুঝে দক্ষিণরায় তার সমস্ত ধনসম্পদ বন্ধু বড়খাঁ গাজির সাহায্যে লুকিয়ে ফেলল আঠারো ভাঁটির দেশে, নদী মোহনায়। আর কপিলমুনির বরে বলীয়ান বনবিবি-শাহজঙ্গুলি ধোনামৌলের ফেলে যাওয়া দাসীপুত্র দুখেকে বাঁচানোর অছিলায় দক্ষিণরায়কে শায়েস্তা করল। দক্ষিণরায়-বড়খাঁ গাজি বশ্যতা মানল বনবিবি আর কপিলমুনির।

মূল মিথে বেরাহিম গাজির হানাদারি বৃত্তির কোনও উল্লেখ যেমন নেই, তেমনি উল্লেখ নেই তার হাত থেকে বাঁচার জন্য জনসাধারণের দক্ষিণরায়কে নেতা বলে নির্বাচনেরও। বেরাহিম গাজি ও দক্ষিণরায় সম্পূর্ণত সংযোগহীন সেখানে— বেরাহিম মক্কার এক বণিক, আর দক্ষিণরায় বা 'রায়সনাতন' ভাটির শাসক দণ্ডাবক্ষ আর নারায়ণীর পুত্র— শক্তির উপাসনা করে যে নরবলি দিয়ে তার মাংস খেত। বনবিবি-শাহজঙ্গুলি সেখানে দৈবপ্রেরিত অবতারকল্প মানুষ, যারা মক্কা থেকে খোদার নির্দেশে ভাটিদেশ দখল করতে আসে। কপিলমুনির কোনও উল্লেখ নেই, বরং পাওয়া যায় ভাঙ্গরপীরের নাম, যার কাছ থেকে নবাগত বনবিবি-শাহজঙ্গুলি জানতে পারে যে দক্ষিণরায় হল 'ভাটির ঈশ্বর'— মোম-মধুর অধীশ্বর সে। তাছাড়া বনবিবি-দক্ষিণরায়ের প্রত্যক্ষ যুদ্ধেরও কোনও উল্লেখ নেই— লড়াই হয় বনবিবি-নারায়ণী এবং শাহজঙ্গুলি ও দক্ষিণরায়ের

মধ্যে। ধোনা-মোনার পালায় দক্ষিণরায় ভাটির মোম-মধুর অধিকারী এক লোকদেবতা— যে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মতই ভয় দেখিয়ে পুজো আদায় করতে চায়।

সামগ্রিকভাবে কাহিনিটির চরিত্রগত বদল ঘটিয়েছেন লেখক। মূল মিথের রাজপুত্র বা জমিদারনন্দন দক্ষিণরায় এখানে যেন সাধারণ মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি— যে সমস্যার হাত থেকে মানুষকে প্রাথমিকভাবে রক্ষা করে ঠিকই, কিন্তু ক্রমশ নিজেই বৃহত্তর সমস্যায় পরিণত হয়। বাদার সামান্য নারী গুলাল বিবির জন্মগতভাবে দৈবশক্তিহীন পুত্রকন্যা শাহজঙ্গুলি-বনবিবি পরিণত হয় অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিতে— যাদের দ্বারা কপিলমুনি স্বৈরাচারী দক্ষিণরায়ের শাসনের অবসান ঘটান। মূল মিথের চরিত্রগুলিকে আশ্রয় করে রচিত এই নতুন মিথকে একালের সমাজজীবনের দর্পণ করে তোলেন যেন লেখক, গোটা লোকপুরাণটিকেই নিম্নবর্গের অত্যাচারিত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুনর্লিখিত করে পরিণত করেন শোষিতের নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার আখ্যানে। তাই লোকদেবতা দক্ষিণরায় এ আখ্যানে পরিণত হয় 'নরখাদক বাঘের দেবতা'য়— আর এই লোকপুরাণ-আশ্রয়ী সাধারণ মানুষের চোখে যে কোনও অত্যাচারী, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ব্যক্তি অথবা সমষ্টি একীভূত হয়ে যায় দক্ষিণরায়ের সঙ্গে।

পাশাপাশি, একই লোকপুরাণের মধ্যেকার অন্য একটি অভিমুখকেও উপস্থাপন করেন লেখক। সমগ্র লোকপুরাণটির মধ্যে দক্ষিণরায়ই কেবল বাদার ভূমিপুত্র— বনবিবি, শাহজঙ্গুলি, কপিলমুনি প্রত্যেকেই বহিরাগত। কিন্তু এদেরই হাতে বাস্তুহারা হয় দক্ষিণরায়— হারায় তার অখণ্ড মাটির অধিকার। বাদায় তার চলাচলের সীমানা নির্দিষ্ট করে দেন কপিলমুনি। কেড়ে নেওয়া হয় তার আঠারো ভাটির সম্পদকে। বাউলে-কাঠকাটানিয়াদের চোখে দক্ষিণরায়েরই আরেক রূপ যে কোস্টগার্ড অধর রায়, সে উন্মূলনের নিজস্ব বেদনায় অনুধাবন করতে পারে দক্ষিণরায়ের যন্ত্রণার স্বরূপটি। তার সেই বেদনার্ত সত্তার কল্পনায় ঐতিহাসিক প্রতিবেশ, মিথ আর সমকালীন বাস্তব হাত ধরাধরি করে চলে। যে বাঘ সাধারণের চোখে প্রাণঘাতক, দক্ষিণরায়ের মূর্ত প্রতিরূপ— সেই বাঘই অধরের চোখে ছিন্নমূল প্রাণের প্রতীক হয়ে ওঠে, যখন সে বাঘ দীর্ঘপথ-নদী-সাগর সাঁতরে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় এসে পৌঁছয়। দুই বাংলার মাটিকে বিভাজিত করে রাখা কাঁটাবেড়ার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেও হয়ে ওঠে এক "শিকড় আলগা পুরুষ বাঘ"[২২] — ফেলে আসা মাতৃভূমির কথা মনে করে তার বুকের খাঁচায় কান্নার তুফান ওঠে। একদিকে নেহরু, প্যাটেল, জিন্নারা মিলে দুই দেশের মাঝে ওই কাঁটাতারের বেড়া লাগিয়ে দেয়, ছিনিয়ে নেয় যেন সাধারণ মানুষের নিজস্ব আঠারো ভাঁটির সম্পদকে— যে সম্পদ নিহিত ছিল সম্প্রদায় নির্বিশেষে স্নেহপ্রেমপ্রীতির সম্পর্কে, ছিল অখণ্ড জল-মাটি-আকাশে; অন্যদিকে ইয়াহিয়া খান-ভুট্টো-খানসেনারা মিলে ছিনিয়ে নিতে চায় তাদের শেষ-সম্বল ভাষা আর বাস্তুভিটেটুকুও। দক্ষিণরায়ের চোখে, অধরের চোখে এরাই বহিরাগত শত্রু— কপিলমুনি, বনবিবি, শাহজঙ্গুলি— যারা একদিন কেড়ে নিয়েছিল তার সর্বস্ব। তাই মুদ্রার অন্য পিঠটাও সে দেখতে পায়, বলে—

> "বাঘ শুধু মানুষ খায় না কাজলা। মানুষেও তারে খায়।"[২৩]

শিকড় আলগা বাঘটা নদী-বাদা সাঁতরে এসে পৌঁছয় ছোটো চামটেতে। কোনও এক ঋতুমতী বাঘিনির দেহদিগরের আতপ গন্ধই নয় কেবল— তার বাস্তুহারা প্রাণকে তাড়িত ক'রে মাটি পাওয়ার বাসনা, শিকড় গাড়ার স্বপ্ন। একটা আশ্রয় পাওয়ার উত্তুঙ্গ বাসনায় সে বারবার ঝাঁপ দেয় কাঁটাবেড়ায়, ব্যর্থ হয়, আহত হয়— কিন্তু লড়াই ছাড়ে না। লড়াই ছাড়েনি অধরও।

> "ধ্বজি থেকে বেনাপোল-পেট্রাপোল, সেখান থেকে বনগাঁ। কতবার যে আছড়ে পড়েছি। ক্ষতবিক্ষত হয়ে(ছি)। তার কি ইয়ত্তা আছে!"[২৪]

সীমান্তের বস্তুগত কাঁটাবেড়া শুধু নয়— জীবনের সর্বত্রই তার সামনে কোনও-না-কোনও কাঁটাবেড়া এসেছে, যখনই সে শিকড় গাড়তে চেয়েছে। কাঁটাতারে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে তাকে বারবার। সীমান্ত পেরিয়ে আসা আশ্রয়প্রত্যাশী অধরের কাছে কাঁটাতার হয়ে উঠেছে এপারের মানুষের অসহযোগ, মমত্বহীনতা, উদ্বাস্তু বলে দূরে সরিয়ে রাখা, বিশ্বাসহীনতা। পায়ের তলায় মাটি পাওয়ার জন্য তাকে লড়তে হয়েছে দীর্ঘ দশ বছর—

> "দশটা বছর আমিও অমন লাফ মেরেছি রে পুরুষ। একবার দুবার নয় শতবার হাজার বার।"[২৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আর তারপর সে পেয়েছে কোনো এক বাঘিনির শরীরের আতপ্ত প্রাণ— যুবতী নারী শরীরের ঘ্রাণ। ছিন্নশিকড় অধর শিকড় চারিয়ে দিতে চেয়েছে যেখানে-সেখানে, বারবার। কিন্তু সেখানেও কাঁটাবেড়ায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সে। কখনও বিবাহিত স্ত্রী অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয়ে মূলোচ্ছেদ করেছে তার, কখনও আবার সাবাড়ে রমণী কাজলার শরীরে শিকড় গাড়তে চেয়ে বাধা পেয়েছে প্রচলিত লোকবিশ্বাসে। জীবনের পরতে পরতে এভাবেই কাঁটাতার পেরোনোর মর্মান্তিক চেষ্টায় দেহমনের অজস্র ক্ষতে রক্ত ঝরেছে তার।

আর তাই অধর আজ আর মেনে নিতে পারে না কোনও উচ্ছেদকের অস্তিত্ব, সইতে পারে না কাঁটাবেড়া। লোকপুরাণের পরস্বাপহারক স্বৈরাচারী দক্ষিণরায়ের উদ্বাস্তু রূপটিই কেবল তার চোখে বড় হয়ে ওঠে। দক্ষিণরায়েরই অনুষঙ্গ কোথাও চলে আসে বেড়া পেরোতে চাওয়া বাঘ কেবল নয়, পাচারকারী, জলদস্যু, মাওবাদী এমনকি বেআইনি কাঠকাটানিয়াদের ক্ষেত্রেও। তাই তার মনে হয়, কাঁটাবেড়া কেটে দেওয়া উচিত, যাতে সে-বেড়া পেরোতে গিয়ে আর কেউ রক্তাক্ত না হয়। কিন্তু এই জলদস্যু, মাওবাদীদের ক্রিয়াকলাপে যে অশুভত্ব আছে, যে অশুভবোধ ছিল মিথীয় দক্ষিণরায় চরিত্রের মূলেও— সে সম্পর্কে অধর অসচেতন নয়। সমাজের উচ্চবর্গীয় ক্ষমতাবান মানুষগুলিও ওই অশুভশক্তির প্রতিনিধি মাওবাদী-জলদস্যুদেরই দোসর আজ। তাই তার বক্তব্যে প্রকাশিত হয় দ্বৈত তাৎপর্য—

> "বললাম তো এটা দক্ষিণরায়ের যুগ। ওর সম্পদ কপিলমুনি, বনবিবি আর শাহজঙ্গুলি মিলে কেড়ে নিয়েছিল! সব ফেরত দেওয়ার সময় এসেছে বুঝলে?"[২৬]

মিথীয় আবহে সমকালীন সমাজ পরিস্থিতিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেন লেখক। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এ ঘোষণা কেবলমাত্র একদেশদর্শী হয়ে থাকে না, অধরের চোখে বনবিবি-শাহজঙ্গুলিই হয়ে যায় উচ্ছেদক, অত্যাচারী। এ যেন লোকপুরাণের পাল্টা বয়ান— বলা যায় দক্ষিণরায়ের বয়ান।

ছিন্নমূলত্ব আর শিকড় গাড়তে না পারাই অধর চরিত্রের মূলগত বেদনা। তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হয় ওই বেদনার দ্বারাই। আর সেকারণেই শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে সে তার পক্ষ স্থির করতে পারে না। যে-কোনও উচ্ছেদক— সে সামাজিকভাবে ন্যায় বা অন্যায় যে পক্ষধারীই হোক না কেন— অধরের দৃষ্টিতে সে অন্যায়কারী। তাই জম্বুদ্বীপে জলদস্যুদের আক্রমণ, লুঠপাট ঠেকাতে পুলিশ-কোস্টগার্ডের মিলিত অভিযানে বেআইনি বসতি উচ্ছেদের খবর শুনে তার বাস্তুহীনতার ক্ষতে রক্ত ঝরে। কী পুলিশ কী জলদস্যু— কাউকেই সে তাই ঘেঁষতে দিতে চায় না ছোটো চামটের কাছে। একইভাবে, তার আর বঙ্কিমের বিরুদ্ধে বেআইনি কাঠ পাচারের অভিযোগ ওঠায় যখন তার চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়, তখন আরেকবার ছিন্নমূল হতে বসে অধর। আর এ জন্য মূলত দায়ী যারা, সেই কাঠকাটানিয়া দল, কাজলা, হানিফ— এরাই তার চোখে শত্রু হয়ে ওঠে— তার ভিটে হারানোর, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের কাঁটাতারের জন্য মূলত যারা দায়ী সেই নেহরু, জিন্না, প্যাটেলদের সঙ্গে এক হয়ে যায় এরা— তার দৃষ্টিতে। তাই কাজলার পায়ে গুলি চালায় অধর, বন্দুক তাক করে সমগ্র দলটির দিকেই। কাজলার মুখে সীমান্ত পেরোতে চাওয়া বাঘটির মৃতুসংবাদ শুনেই তার এই প্রতিক্রিয়া হয়। বাঘটি তার কাছে জীবনের কাঁটাতার পেরোতে চাওয়া এক লড়াকু সত্তা ছিল, ছিল তার নিজেরই এক প্রতিমূর্তি। বাঘটির পরাজয় তাই অধরের আত্মিক পরাজয়েরই সামিল। সম্ভবত লেখকেরই কল্পনার নির্মাণ যে সৃষ্টিবিষয়ক মিথটি উপন্যাসের প্রথমাংশ থেকেই উল্লিখিত হয় বারবার— সহবাসেচ্ছু বাঘের ব্যর্থসংগমে স্খলিত পুরুষবীর্য সাগরের বুকে নতুন দ্বীপের জন্ম দেয়— সেটিও জড়িয়ে ছিল বাঘটির সঙ্গে। নিজস্ব চেতনায় অধর মিথটিকে কিছুটা পরিবর্তিত করে নিয়েছিল, শরীরে গর্ভপুজোর মাধ্যমে পুরুষ বাঘের বীর্যে নতুন সন্তান সৃষ্টিকেই সে নতুন চরার সৃষ্টি বলে মনে করেছে। বাঘটির মৃত্যু তার কাছে সেই চরা জাগবার সম্ভাবনার বিনষ্টির, তার শিকড় গাড়ার স্বপ্নের মৃত্যুর প্রতীক হয়ে উঠেছে।

স্পষ্টতই ইতিহাস ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত অধর চরিত্রটির অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে থাকলেও সে ইতিহাস কেবল অধরের যন্ত্রণার পটভূমি নির্মাণ করে গেছে। সমকালীন বাস্তব পরিস্থিতিতে তার উচ্ছিন্নতার বেদনা আর শিকড় গাড়তে না পারার যন্ত্রণাকে ভাষা দিয়েছে মিথ আর প্রতীক। শিকড়হীনতার বেদনা আর নতুন করে শিকড় গাড়ার স্বপ্নের রূপায়ন ঘটিয়েছেন লেখক কাজলার চরিত্রেও। বাঘের পেটে স্বামী হারিয়ে সামাজিকভাবে যেমন সে ছিন্নমূল, তেমনি ছিন্নমূল সে পেশাগতভাবেও—

> "সাবাড়ের জীবনে কুনো শিকড় নাই।"[২৭]

শিকড়হীন এই জীবনের অবসান ঘটানোর তাগিদেই হানিফ-হলধরদের সঙ্গে তার ছোটো চামটেতে যাত্রা— অধরকে নিজের দেহের যুবতী-গন্ধে মাতিয়ে-ভুলিয়ে রাখতে। পুরুষের লোলুপ কামনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সে বনবিবি সেজেছিল, নিজের চারপাশে ঘেরাটোপ দিয়েছিল নানা বিধি-নিষেধের, ট্যাবুর। কিন্তু সেই ট্যাবুই যেন তার শিকড় গাড়ার পথে কাঁটাতার হয়ে দাঁড়ায়। অধর-রূপী পুরুষ বাঘের আহ্বানে আকৃষ্ট হয় সে, কিন্তু ট্যাবুর বেড়া ডিঙিয়ে মিলিত হতে পারে না বাঘের সঙ্গে— ফুঁসে উঠেও বেড়া ডিঙোতে পারে না। শেষবারের মত বেড়া ভাঙতে গিয়েই রক্তাক্ত হয় কাজলা, অধরের গুলি খায়। দক্ষিণরায় আর বনবিবি এক আসনেই যেন বসে থাকে— অধর আহত হয় মানসিকভাবে, আর কাজলা শরীরে। কাজলার এই বেড়া ডিঙোতে চাওয়ার বিষয়টি লেখক প্রত্যক্ষভাবে কখনোই তুলে ধরেননি। পাঠককে কাহিনি ও চরিত্রের এই দিকটি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে মূলত বইটির প্রচ্ছদ— যেখানে নারীর মুখ-হাত-পা এবং বাঘিনির শরীর বিশিষ্ট 'গাঙ বাঘিনি' ঝাঁপ দেয় কাঁটাবেড়ায়— যে বেড়ার কালো রং বাখিনির ছোঁয়ায় লাল— যে লাল রং বাঘিনির রক্তের রক্তিমা। কাঠকাটানিয়া দলটিও চেয়েছিল শিকড় গাড়তে, প্রতিষ্ঠিত হতে।

> "দশটা দিনে পাঁচবার কাঠবোঝাই ট্রলার, কলসে-ঠাকরানে-হ্যালিডের পারে বদল কইরতে চাই। তা যদি পারি দিদি ... হলধর চাটনি খাওয়ার ভঙ্গিতে মুখের জল ভিতরে টানে—"[২৮]

কিন্তু তাদের এ আশাও পূর্ণ হয় না। বস্তুত গোটা আখ্যান জুড়েই বারবার বেজে ওঠে ছিন্নশিকড় সত্তার হাহাকার, আর শিকড় গাড়তে না পারার আর্তস্বর।

কাজলা আর হানিফ সাঁইদার এ উপন্যাসে অনেকটা যেন বনবিবি আর কপিলমুনির প্রতীক। 'দক্ষিণরায়ের যুগ' বলেই হয়তো এই সাধারণ মানুষগুলিও ছলনা আর অন্যায়ের দ্বারস্থ হয়। লেখকসৃষ্ট নতুন মিথের বনবিবিকে কপিলমুনি ব্যবহার করেছিলেন দক্ষিণরায়কে শায়েস্তা করতে, আর আজকের 'কপিল' হানিফ কাজলাকে ব্যবহার করে অধর তথা দক্ষিণরায়কে প্রলুব্ধ করতে, নিজেদের কাজ হাসিল করতে। সেদিনের কপিল-বনবিবি সাধারণ মানুষের সম্পদ বাঁচাতে চেয়েছিল কিন্তু আজকের কপিল-বনবিবি সে-সম্পদ পাচারকারী। বস্তুত উপন্যাসের শুরুতেই দক্ষিণরায়-বনবিবির একাসনে পুজো হতে দেখা গিয়েছিল— কাহিনিতেও বনবিবির দল আর দক্ষিণরায়ের মধ্যে তফাৎ থাকে খুব সামান্যই। তবু শেষপর্যন্ত লেখক ভরসা রাখেন সাধারণ মানুষের অন্তর্নিহিত শুভবোধের উপরেই। চারিদিক থেকে দক্ষিণরায়ের নানা মূর্তির আকস্মিক হানায় পর্যুদস্ত দলটিকে তাই সাহসে যোগায় হানিফ—

> "দরকার হলে লড়াই দিতি হবে! ...মা বনবিবি মহাযুদ্ধের আখ্যান মনে পড়ে তোমার? ...তব্যে? বাদায় তো এটাই রীতি হলধর!"[২৯]

সমকালকে চিরকালের পটে স্থাপন করে নতুন এক মিথ সৃজনের পথে এগিয়ে যান লেখক। এ মিথ এ যুগের, এ কালের মিথ। মিথ, কল্পনা, সমকালীন বাস্তব পরিস্থিতি এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের সুচারু মিশ্রণে স্বল্পাকৃতি এই উপন্যাসটিতে লেখক 'কালের মহাইঙ্গিতটিকে মূর্ত' করতে অনেকখানিই সফল হয়েছেন— এ কথা তাই স্বচ্ছন্দে বলা যায়।

Reference:

১. নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল এবং অন্যান্য, 'সাক্ষাৎকার: সোহারাব হোসেন', সমকালের জিয়নকাঠি, সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, প্রথম খণ্ড, (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১১), পৃ. ৬২৯

২. আলি, ওয়াজেদ, 'জঙ্গলের ভয়াল নিসর্গে', সমকালের জিয়নকাঠি, সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা, প্রথম খণ্ড, (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০) : পৃ. ৫০৫-৫০৬

৩. নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল এবং অন্যান্য, 'সাক্ষাৎকার : সোহারাব হোসেন', সমকালের জিয়নকাঠি, সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, প্রথম খণ্ড, (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১১), পৃ. ৫৩১

৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'সরম আলির ভুবন : বাস্তব ও মায়ার যুগলবন্দি', স্মারক : ৫০-শে পাসোহারাব হোসেন, (২৫ নভেম্বর ২০১৫) : পৃ. ৮৮

৫. ঐ, পৃ. ৮৮
৬. হোসেন, সোহারাব, 'বলার কথা', গাঙ বাঘিনি প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৭
৭. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০১, পৃ. ১১৫
৮. নস্কর, ড. দেবব্রত, চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী : পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯, পৃ. ৩৭২
৯. হোসেন, সোহারাব, গাঙ বাঘিনি, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৪৬
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল, 'জলদস্যুদের হাত থেকে সুন্দরবন কতটা সুরক্ষিত', সমকালের জিয়নকাঠি, সুন্দরবন : সমস্যা ও সম্ভাবনা-১, (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫), পৃ. ২৪১
১১. ঘোষ, অমিতাভ, 'ভূমিকার বদলে', সুন্দরবনের গপ্পোসপ্পো, তুষার কাঞ্জিলাল, কলকাতা, আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬, পৃ. ৬
১২. হোসেন, সোহারাব, ঐ, পৃ. ১৪৫
১৩. ঐ, পৃ. ১৪
১৪. ঐ, পৃ. ১৪০-১৪১
১৫. ঐ, পৃ. ৩২
১৬. ঐ, পৃ. ১৪৫
১৭. ঐ, পৃ. ২৮
১৮. ঐ
১৯. ঐ, পৃ. ২৯
২০. ঐ
২১. ঐ
২২. ঐ, পৃ. ৬১
২৩. ঐ, পৃ. ১২৫
২৪. ঐ, পৃ. ১০৪
২৫. ঐ, পৃ. ১২৪
২৬. ঐ, পৃ. ১২৬
২৭. ঐ, পৃ. ২৩
২৮. ঐ, পৃ. ১১৩
২৯. ঐ, পৃ. ১৬৬

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :
সোহারাব হোসেন, গাঙ বাঘিনি, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা দে'জ পাবলিশিং, ২০১১, প্রকাশিত।

সহায়ক গ্রন্থ :
চন্দ্রমন্ত্রী সেনগুপ্ত, মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০১, প্রকাশিত।
ড. দেবব্রত নস্কর, চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী : পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯, প্রকাশিত।
পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০১০, প্রকাশিত।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 350
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পত্রিকা :

নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল সম্পাদিত, সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা, সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা প্রথম খণ্ড, (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০), প্রকাশিত।

নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল সম্পাদিত, সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা, সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, প্রথম খণ্ড, (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১১), প্রকাশিত।